International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VII, August 2015, Page No. 39-45
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস : আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার এক নিঁখুত দলিল

ড. সোমা কুশারী
সহকারী শিক্ষক, মন্ডলপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামনগর, কলকাতা, ভারত

Abstract

In case of Bengali Novel, Short Stories, etc., Suchitra Bhattacharjee is a prominent name; she is an exceptional writer. Her premature demise is a great loss not only in the Bengali literature but also struck the minds of huge number of Bengali readers. Sufferings of modern society; death of faith etc. find a distinct voice in her writings. Her most famous writings on this 21st century, Viz. Bhagankal, Gavir Asukh, Nil Ghurni have been discussed in this article, which help us to realize law learners' livelihood, loss of their mankind and greediness.

গত তিনদশকের অধিক সময় সুচিত্রা ভট্টাচার্য বাংলা উপন্যাসের জনপ্রিয় লেখিকা হিসাবে অসংখ্য পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। নানানসময় তাঁর ঔপন্যাসগুলি যেন সময়ের স্মারক হয়ে আমাদের আধুনিক শহুরে শিক্ষিত জীবনের বেঁচে থাকার হাজাররকম সমস্যার সম্মুখীন করেছে - আমরা স্তব্ধ হয়েছি বিমূঢ় হয়ে ভেবেছি এই একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাটিকে এভাবে নাটকীয় উপাদানে মুড়ে কোন্ অসামান্য শক্তিবলে তিনি এতসুখপাঠ্য উপন্যাস করে তুললেন? লেখিকা যে তাঁর সর্বত্রগামী দুটি চোখ মেলে দেখে নিয়েছেন আজকের পচনশীল নৈতিকতার বাস্তবরূপ। আজকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার মুহূর্তে আমাদের অতিপরিচিত তিনটি উপন্যাস নিয়েই যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছাতে চেষ্টা করব, হয়তো তা পল্লবগ্রাহিতার নামান্তর তবু বিন্দুতেও কখনও কখনও সিন্ধুদর্শন ঘটে।

সুচিত্রার তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস যেমন— ভাঙন কাল (নভেম্বর- ১৯৯৬), গভীর অসুখ (জানুয়ারী ১৯৯৮), নীলঘুর্নি (জানুয়ারী ২০০১)।

এই তিনটি উপন্যাসের বিষয়গত বৈচিত্র্য অবলোকন করলে দেখা যায় 'ভাঙনকাল'-সরকারী চাকুরে উচ্চমধ্যবিত্ত চন্দন রায় চৌধুরীর পরিবারের কাহিনী, কিভাবে বিত্তবাসনা আর অবিরত চাহিদা একটি সংসারের প্রতিটি মানুষকে গ্রাস করে, শেষপর্যন্ত পরিবারের নবীন সদস্যটি পর্যন্ত সবকিছু কিনে নিতে শিখে যায় তারই সূচীমুখবিবরণ পাই এ উপন্যাসে।

'গভীর অসুখ' অধ্যাপক অভিজিৎ আর তার পরিবারের গল্প। পিতা অমলকান্তির সম্ভাব্য কর্কট রোগ কিভাবে পরতে পরতে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবনে থাবাপাতে এবং শেষপর্যন্ত প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা আসলে অমলকান্তির একার নয় আধুনিক মানুষের জীবনযাপনই কর্কটাচ্ছন্ন।

নীলঘুর্ণিকে অসমবয়সী নারীপুরুষের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে জড়িয়ে পড়া ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার গল্প বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। আলোক সামান্য প্রতিভার অধিকারী বোধিসত্ত্ব মজুমদার নামী বিজ্ঞানী, এম.এস.সি. প্রথমবর্ষের ছাত্রী দয়িতার সমর্পণে তিনি বেপথু হয়তো বা স্ত্রী রাখীর মধ্যে আবেগের স্ফুলিঙ্গ খুঁজে না পেয়ে ক্লান্তও অন্যদিকে দয়িতার বীরপুজো' শেষপর্যন্ত প্রিয়পুরুষের যৌনসঙ্গিনী হয়েই তৃপ্তি খুঁজে নিতে চেয়েছে এই তিনটি মানুষের মানসিক টানা পোড়নে উত্তর আধুনিক সৌমিক বসুরায় যেন লেখিকার মানস কল্পনার সেই ওয়েসিস যা শেষপর্যন্ত বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েও বোধ হয় অসম্ভবতার যাদুবস্তুবের সওদাগর-স্বপ্ন বিলি করে।

'ভাঙনকাল' উপন্যাসটি আদর্শ ও আদর্শহীনতার লড়াই। দুই প্রজন্মের দুই পিতা পুত্র, অদ্রীনাথ রায়চৌধুরী স্কুল শিক্ষক আদর্শবান বহুদিন মৃত। তার একমাত্র পুত্র চন্দন সরকারী অফিসার আদর্শকে টয়লেট পেপারের মত বহুদিন আগেই ব্যবহার

করে ছুঁড়ে ফেলেছে। স্ত্রী অনুরাধা 'আদর্শ স্ত্রী' নৈতিকতাবর্জিত স্বামীর যোগ্য সহচরিত্বকে যদি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য বলা যায় তবে অনুরাধা সত্যিই তাই। এদের একমাত্র সন্তান রাজা ওরফে সৌভিক মাধ্যামিক পরীক্ষার্থী। শিশুবয়স থেকেই অজস্র-অসংখ্য-অনাবশ্যক প্রাপ্তি তাকে শিখিয়েছে "বাপ-মা" নামক সম্পর্কগুলি সমাজে একমাত্র চাহিদাপূরণের সামগ্রিক অন্য নাম। এই পরিবারের কন্যা লাজু চন্দনের বোন অথচ মৃত অদ্রীনাথ তার শিরায় শিরায় বিরাজমান একদা কমরেড স্বামী সাত্যকিকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও অধুনা প্রোমোটার মানুষটিকে মেনে নিতে তার কষ্ট হয়। শেষপর্যন্ত লাজু গৃহত্যাগ করে। অথচ ৩১শে ডিসেম্বর বর্ষবরণের রাতে 'নারী-সুরায়' নিমজ্জিত স্বামীর হাজবাঘ অনুরাধাকে দিয়ে সংসার ত্যাগ করাতে পারে না। লেখিকা দুটি পার্শ্বচরিত্র সচেতন ভাবে নির্মাণ করেন অসফল খামখেয়ালি ছোটকু অনুরাধার ছোটভাই আর লাজুর ঈষৎ পুরুষানি বন্ধু কৃষ্ণা। একজন সহজে ধোকা দেবার জন্য মাছুলি বিক্রির ব্যবসা ফাঁদতে চায় অথচ দিদির টাকা নিয়ে বাঁকা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। অন্যজন বৃদ্ধা অসুস্থ মাকে সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও অতিযত্নে রক্ষা করে। বিপন্ন বান্ধবী আর তার পুষ্যিকে হাসিমুখে আশ্রয় দেয়। মা প্রতিভা যেন লেখিকার জীবনদর্শনের প্রবক্তা সব বুঝে তিনি যেন সর্বংসহা হয়ে বিষ পান করে চলেন।

চন্দনের লোভ সংক্রামক ব্যাধির মত যেদিন পুত্র রাজাকে টোকাটুকির বৃত্তে ঠেলে দেয়, হয়তো পাঠক সেদিন শিউরে উঠে আশা করছিলেন চন্দন বোধ হয় এবার নিজেকে শুধরে নেবেন যেমন লাজুর গৃহত্যাগ মাত্যকির পরিবর্তনই অভিপ্রেত ছিল লেখিকা তার মুন্সিয়ানা দেখান উপন্যাসের শেষপর্যন্ত আমরা দেখি সাত্যকি চন্দন নুকন জাল বোনে মাধ্যমিকের অসংখ্য পরীক্ষার্থীর খাতা থেকে রাজার খাতা বার করে চলে তাকে মুক্ত করার নিখুঁত পরিকল্পনা বিনিময়ে লাজুকে সাত্যকির জীবনে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় চন্দন। মনে পড়ে যায় অদ্রীনাথের উক্তি— "ভিতু মানুষরা বড় লোভী হয় আবার লালসার জন্যে কষ্টেও ভোগে বড়।"

'গভীর অসুখের' অভিজিৎ দায়িত্ববান পুত্র স্বামী হিসাবে সন্তান হিসাবে তাঁর কর্তব্যে ত্রুটি খুঁজে পাওয়া ভার। একদিকে নিজস্ব একটুকরো বাসস্থানের আকাঙ্খা অন্যদিকে বাবার চিকিৎসার ভার বইতে গিয়ে অভিজিৎ টলোমলো। স্ত্রী ঋতু শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি খুব একটা আন্তরিক না হলেও খুব একটা স্বার্থপরও বলা চলে না। ভাই ইন্দ্রজিৎ বরঞ্চ টিপিক্যাল শহুরে যুবক দয়মন্তির প্রতি প্রেম, ভবিষ্যত পরিকল্পনা সব ক্ষেত্রেই সে মেপে পা ফেলতে চায়। মৃত্যু পথযাত্রী বাবাকে ডাক্তার দেখানোর চেয়ে প্রেমিকার কাছে কথারাখা তার কাছে বেশি জরুরী। অমলকান্তি চরিত্রটি আর একবার মধ্যবিত্ত, উচ্চাশাহীন পরিবার অন্তপ্রাণ পিতাদের মনে করান। কন্যা অনসূয়া স্বামী ধীমানের প্রতি অতিনির্ভরশীল একটি মতো উপলব্ধি করে জীবনে স্বনির্ভর হবার প্রয়োজন কতখানি?

> "বিয়ের পর এই প্রথম অনসূয়া বসুমল্লিকের ওপর ধিক্কার জাগছিল অমলকান্তির মেয়ের। বাবার শ্রমে পড়ে দেওয়া বি.এ. এম.এ. ডিগ্রীগুলো কণ্ঠ হার নয়, কৈলস বনে গেছে, কেন যে অনসূয়া একটা চাকরীর চেষ্টা করেনি কোনওদিন।"

আজকের দিনে চিকিৎসক রোগীর ক্রেতাবিক্রেতা সম্পর্ক যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই উপন্যাসে তেমনি মহার্ঘ চিকিৎসার ধারায় টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া মানবিক সম্পর্কের মুখোশগুলি লেখিকা নিপুন ভবে জড়ো করেন। রোগীর স্ত্রী কল্যাণীর ছেলে মেয়ের বিশ্রি পারস্পরিক দোষারোপের মধ্যে একবার মাত্র সোচ্চার হয়ে ওঠা এক কথায় অসামান্য। অভিজিৎ-এর আত্মপীড়ন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার চিকিৎসার খরচ বয়ে নিয়ে যাবার ভাবনা ইন্দ্রজিৎ দিল্লী চলে যাবার বাসনা একটি মাত্র ফোনকরে সব সমস্যা মিটে যায় অমলকান্তি সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন- আর এই গোটা পরিবারটির যাবতীয় সম্পর্কগুলি আক্রান্ত হয় এক ভয়ঙ্কর রোগে- যার নাম বিশ্বাসহীনতা।

'নীলঘুর্ণি' আধুনিক যুগের আত্মঅন্বেষণ বোধিসত্ত্ব একনিষ্ঠ স্ত্রীকে ত্যাগ করেন যৌন তাড়নায়, স্ত্রীকে ত্যাগ করার যুক্তি দেখান 'You donol deserve to be my companion: দয়িতা মাত্র একুশের সুন্দরী যুবতী প্রৌঢ় বোধিসত্ত্বর নতুন অন্বেষণ যেভাবে তিনি মহাজাগতিক রহস্য উন্মোচন নিমজ্জিত হন তেমনি রাখী থেকে দয়িতা হয়ে হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির দুরন্ত সাফল্যের সোপান তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। পুত্র শুদ্ধসত্ত্ব যেমন এই অধ্যাপক বিত্তজনীর মনে কোনো স্নেহ সঞ্চয় করতে পারেনি দয়িতার অঙ্গত সন্তান কেও তিনি অনায়াসে গর্ভেই হত্যা করার নিদান দেন। দয়িতার সঙ্গে প্রভুত্ব কামিতায় না মিললেই পুরোনো স্ত্রীর পিতৃগৃহের পথ হাঁটতে কসুর করেন না, মেয়ের বয়সী দয়িতাকে নিয়ে মগ্ন বিজ্ঞানী নিজের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগায় ক্যাম্পাস টাউন ছাড়েন আবার অবাঞ্চিত পিতৃত্বের দায় ঝেড়ে ফেলার বাসনায় বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছেড়ে যেতে চান—একদিকে সামাজিক মর্যাদা অন্যদিকে 'রাখীর' মত ভক্তিময়ী স্ত্রী পেলে সুখ সাচ্ছন্দ্যে কোন ঘাটতি থাকে না।

দয়িতা আবেগের বশে কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্যে রেখে যতই তার নিজস্ব ভুবনে ঢুকে পড়েছে ততই অনুভব করেছে রাখী আর তার পরম কাঙ্খিত পুরুষটি আসলে শরীর সর্বস্ব নিতান্তই সাধারণ এক মানুষ- যার সাফল্যের খিদে আর রিপুরতাড়না দুটিই সমান সক্রিয়। সন্ধে আসে নিজের প্রতি এক ভয়াবহ নার্সিমিষ্ট মানসিকতা তাই দয়িতার চাকরী না করার পিছনে তাঁর একটিই যুক্তি— "Just look after me" অবশ্য রাখীর মে ভঙ্গ হতে যে সুদীর্ঘ সময় অপব্যয় হয়েছে দয়িতার ক্ষেত্রে তা হয়নি হয়তো সৌমিক অনুঘটকের কাজ করেছে কিন্তু দয়িতার শিক্ষিত আধুনিক মন অনেক আগেই সত্যিটা বুঝে নিয়েছিল- "আদ্যন্ত রাখীতে সম্পৃক্ত হয়ে থাকা এই সংসারে দয়িতা তা হলে কে?- তবে এই মুহূর্তে সে বোধিসত্ত্বার কে? প্রেমিকা? রক্ষিতা? নর্মসহচরী?"

শেষপর্যন্ত একরকম অঙ্গত সন্তানের কথা ভেবেই দয়িতা বাবা-মার কাছে ফিরে আসে। দোলাচলে দীর্ণ দয়িতার মানসিক টানাপোড়েন অপূর্ব ভঙ্গিতে লেখিকার কলমে ভাষা পায়। সৌমিক চরিত্রটি লেখিকা সুচিত্রার মানস কল্পনা সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি এখন দেখা যাক এই চরিত্রটির গঠনগত দিক- সুদর্শন, শিক্ষিত সৌমিক বসুরায় মায়ের অতিরিক্ত প্রত্যাশার চাপে দমবন্ধ করা শৈশব কৈশোর কাটিয়ে বারংবার মায়ের নিষেধের বেড়াজাল ডিঙ্গাতে চেয়েছে। সুচিত্রা জনপ্রিয় ছোটোগল্প 'ইচ্ছেগাছ'-এর সাথে এই উপন্যাসের কবিতা বসু রায়ের মিল- আশ্চর্য রকমের। সৌমিক দয়িতার প্রতি অনুরক্ত এ কথা যেমন সত্যি তেমনি অবিবাহিত অবাঞ্চিত সন্তানের জননী দয়িতাকে জীবনে গ্রহণ করতে চাওয়ার পেছনে মায়ের প্রতি তার এই তীব্র বিদ্বেষ ও কী সক্রিয় ছিল না? তা ভেবে দেখার বিষয়।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে 'নীলঘুর্ণী' উপন্যাস লেখিকার আধুনিক সমাজের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের গল্প যেমন শোনায় তেমনই সৌমিকের মত আদ্যন্ত বিপর্যস্ত মানুষকে ক্রেতা হিসাবে তুলে এনে হয়তো সামান্য হলেও শান্তির স্বস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে। এ উপন্যাসের অনান্য পার্শ্বচরিত্রগুলি স্বল্প কথায় একেবারেই চরিত্রানুগ এদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য এত সত্যভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে মনে হয় এরা আমাদের পরিবার পায়ে হেঁটে চলে বেড়ানো পরিচিতজন।

সুচিত্রার 'রংবদলায়' উপন্যাসটি লিখিত হয়েছিল প্রথমত টেলিভিসনের পর্দার জন্যে। পরবর্তী সময়ে সেই চিত্রনাট্যকেই তিনি বেঁধে দিলেন উপন্যাসে। বর্তমান প্রজন্মের দুই যুবক-যুবতী সুস্মিতা ও নীলাঞ্জন সহপাঠির থেকে দাম্পত্যে উত্তরণ ঘটায় নিজেদের সম্পর্ককে। মাঝনদীতে ভাসমান নৌকার মত নির্ভর তাদের সেই দাম্পত্যেও কোথা থেকে এসে লাগল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষার ঝড়ো হাওয়া। যে আপাত সমস্যা শূন্য দাম্পত্য হতে পারত আদর্শ প্রেমের গভীর কেন্দ্রস্থল ক্রমশ তাই হয়ে উঠল রণক্ষেত্র। লেখিকা সচেতন ভাবেই সুস্মিতার মধ্যে বুনে দিয়েছেন কর্তব্যবোধ, পিতার প্রতি অসাধারণ মমত্ব আর নীলাঞ্জন? সে এক হেঁটে চলে বেড়ানো বিবেকশূন্য আধুনিক যন্ত্রমানায় বিয়ের পর যে শুধু আত্মসুখে মগ্ন থাকবে বলে ছিঁড়ে ফেলে সব পিছুটান একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রৌঢ় রূপমা তার কাছে অবাঞ্চিত। সুস্মিতার কাকিমা আরতির বিশ্লেষণ "এক একজন এক এক টাইপ হয়। সে যেমন এ বাড়িতেও আসে না, তেমনি তো নিজের বাড়িতেও যায় না। শুধু নিজেরটুকু নিয়ে নিজের মনে থাকতে ভালোবাসে।"

হৃদরোগে আক্রান্ত শ্বশুর মশাই এর চেয়ে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব উন্নতির বঙ্কিমপথ তাই স্ত্রীর সহমর্মি হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী মনোতোষের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ার চেয়ে হাসপাতালের 'মরবিড' অস্বস্তিকর পরিবেশ তাকে ভাবায় বেশি। শেষপর্যন্ত সুস্মিতাকে কিছু না মানিয়েই নীলাঞ্জন ICU তে মৃত্যুর সাথে লড়তে থাকা মনোতোষকে ফেলে রেখে কর্মস্থলে দৌঁড়ায়, তার আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলি ভারী অদ্ভুত "সে তো অপরাধ কিছু করছে না, অকারণে নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা তো সময়ের অপচয়। খানিকপরে সুস্মিতাকে ফোন করে খবর নিয়ে নিলেই যথেষ্ট। এ হেন নীলাঞ্জনকে প্রায় অন্ধকারে রেখে সুস্মিতা যখন তার বাবাকে নিজেদের ফ্লাটে এনে তোলে তখনই ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয়। নীলাঞ্জনের ক্রমশঃ ভদ্রতার মুখোশ খসে যেতে থাকে। বোধ হয় সুস্মিতার আর তার নিজস্ব ভূবন তৈরীর স্বার্থে সে পালাতে চায় বিদেশে এবং সেই পলায়নপর তাকে সে সুন্দর যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে তুলে ধরে, বাপ-মার প্রতি দায়িত্বের প্রশ্নে নীলাঞ্জনের বেনিয়া মনোবৃত্তি একেবারে আধুনিক মানুষের উক্তিকে তুলে ধরে —

> "তারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। মানুষ করেছে আমাদের পিছনে টাকা পয়সা এনার্জি সময়, অনেক কিছুই ঢেলেছেন। বিনিময়ে তাঁদের কোনও প্রত্যাশা থাকতেই পারে। অ্যান্ড উই হুড অলসো বি ডিউটি বাউন্ড। তারা কোন অসুবিধে পড়লে মে বি অসুখ বিসুখ, মে বি আর্থিক সমস্যা আমরা অবশ্যই সাধ্যমতো তাঁদের পাশে থাকব।"

কিন্তু এখানেই দুজনের দ্বন্দ্ব প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে ওঠে শৈশবে ব্লাড ক্যানসারে মাকে হারানো সুস্মিতা বাবাকে সন্তানের মতো স্নেহে-মমতায় জড়িয়ে রাখতে চায়। আর নীলাঞ্জন, সে চায় দুজনের নিভৃত অবসর। সুস্মিতা মনকে বোঝার নীলাঞ্জনের

এই মনোবৃত্তি হয়ত নিজস্ব ধারণার প্রতিফলন "নীলের এই এক দোষ নিজে যা ঠিক মনে করবে, অন্যের কাছে সেটাকে ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে যাবে।" কিন্তু সুস্মিতার এই মনোভাব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। খুড়তুতো ভাই-এর বন্ধু ড. পার্থর অপরিচিত অনাত্মীয় মনোতোষকে সুস্থ করে তোলার একাগ্রতার উল্টোদিকে নীলাঞ্জনের অতিসামান্য দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে তোলপার সুস্মিতার মধ্যে ক্রমশ অসহনীয়তা চারিয়ে দেয় মনোতোষের জন্য ফ্ল্যাটে অন্য টিভি কিনে এনে সুস্মিতা যেন নীলাঞ্জনের অধিকার বোধে হস্তক্ষেপ করে ফেলে। দোলের দিনের ঘটনা এই সমস্যাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় নীলাঞ্জন যখন বন্ধুদের সামনে কুৎসিত ভাষায় মনোতোষ ও সুস্মিতার বিরুদ্ধে গালাগাল করে আর বন্ধু অভিজিৎ মারফৎ সে কথা সুস্মিতার কানে পৌঁছে যায়। শেষপর্যন্ত নীলাঞ্জন সমস্ত ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে প্রকাশ্যে মনোতোষের সামনে উগরে দেয় যাবতীয় অভিযোগ আর সহ্য করতে পারে না সুস্মিতা অসুস্থ বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। এর পরের ঘটনা থেকে নাটকীয় উপকরণ ছেঁটে ফেলেছেন লেখিকা সম্পর্ক জোড়ার চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত সুস্মিতার আচরণ অতি স্বাভাবিক রেখেছেন। এ সমাজে বিবাহিতা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার চাপা আকুতির সঙ্গে আত্মসম্মানবোধ ঋদ্ধ নারীর নিরন্তর যে সংগ্রাম তাকে ছোট ছোট বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নিপুনভাবে "সুস্মিতা কিন্তু ভাল নেই। দ্রুত-গামী দিন গুলোকেও হঠাৎ হঠাৎ অসম্ভব শ্লথ মনে হয় তার। যেন ফুরোতেই চায় না। নিজের ঘর। নিজের হাতেগড়া সংসার থেকে দূরে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত তখন বড় দুঃসহ লাগে।" শেষপর্যন্ত নীলাঞ্জনের একটিমাত্র ফোন কলে একাকিত্বে যন্ত্রনার্ত একনিষ্ট ভালোবাসার মুগ্ধ নতুন করে শুরু করতে চাওয়া সুস্মিতা এসে দাঁড়ায় নিজেরই ফ্লাটের দরজায়। কিন্তু নীলাঞ্জন তার পুরুষঅধি সত্ত্বার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেনা। পার্থকে নিয়ে কুৎসিৎ সন্দেহে আবারও রক্তাক্ত করে সুস্মিতাকে দুজনের অনুশোচনার যুগলবন্দি হয়ত ফাটল ধরা সম্পর্ক্টাকে আবার বেঁধে দেবে সমে এই আশায় অপেক্ষমান পাঠককে লেখিওকা সজোরে কষাঘাত করেন নীলাঞ্জনের একি ভাষা? নাকি নিজস্ব ছাদের তলায় এই রকম ভাবেই কথা বলতে অভ্যস্ত নীলাঞ্জনরা—

> "আমি তোমার ফর্মা করে দিতে পারি। অন কন্ডিসান, ওই ছেলেটাকে তুমি আর এ বাড়িতে এনট্রি দেবোনা। অ্যান্ড নো বাপ নিয়ে আদিখ্যেতা।"

এ কাহিনির পরিসমাপ্তি বড় হৃদয় বিদারক-শুধু কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের কাছে নয় সাধারণ পাঠকের কাছেও। এই উপন্যাসের যাবতীয় পার্শ্বচরিত্র আরতি, সুপ্রকাশ, পার্থ, মন্দিরা, বিল্টু এমনকি মালতীও অতিযত্নে আঁকা। যেন তারা তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা-চাওয়া-পাওয়া নিয়ে রক্তমাংসের উষ্ণতায় সঞ্জিবিত। 'রংবদলায়'- উপন্যাসটি এককথা একটি মিষ্টি রূপকথার অপমৃত্যু—যা আধুনিক একাকী আত্মসর্বস্ব মানুষের অনিবার্য—ভাগ্যলিপি।

'অন্যবসন্ত'—উপন্যাসটি অতি সীমিত আকারের একটি উপন্যাস। এ উপন্যাসেও বাপ-মেয়ের-চরিত্রই সর্বাধিক গুরত্ব পেয়েছে। কন্যা তনিষ্টা আর বাবা শুভেন্দু দুজনে আলাদা দুটি মানুষ হলেও কোথায় যেন তাদের এক রকমের চিন্তাধারা শিকড় গেঁথে বসে আছে-একেই কী বিবেক বলে? নাকি এ এক মধ্যবিত্ত মানুষের আশ্চর্য টানাপোড়েন? তনিষ্টা ইংরেজী সাহিত্যের বৃত্তি ছাত্রী, শৌনক তার উপযুক্ত ভাবী-স্বামী শিক্ষিত ধনী-পরিবারের আদ্যন্ত কেরিয়া ডুবে থাকা সুপুরুষ। যাকে বলে রাজজোটক। অথচ তনিষ্টা মায়ের পছন্দের এই পাত্রকে ভালোবাসার সবকমের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কোথায় যেন তার কেটে যায়। তনিষ্টার জীবনে কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয় মেধাবী অথচ নিম্নমধ্যবিত্তপরিবারের অভিমন্যু। একা সে লড়াই করে সংসার মানিয়ে চলা আর শিল্পসর্বস্ব জীবনের হাতছানির সঙ্গে কিন্তু সবজায়গাতেই সে 'Misfit'। আপোষ করে চলার প্রাণপণ চেষ্টাতেও রক্তক্ষরন ঘটে চলে অবিরত। দীর্ঘ বিশবছরের বেশি সময় যে প্রতিষ্ঠানে ঘাম বাড়িয়েছে হঠাৎই সেখানে ব্রাত্য হয়ে যায় শুভেন্দু। V-R-S নিতে বাধ্য মাত্র তিপান্নর শুভেন্দু বাঁচতে চেয়েছিল তার Passion নাটক দিয়ে তার দল 'সমিধে' বেশি সময় দিয়ে নিজের ফুরিয়ে যাওয়া বুড়িয়ে যাওয়া আটকাতে। কিন্তু সেখানেও সজোরে ধাক্কা খায় কর্ণধার বাসবেন্দ্র 'নাটক' নয় কখন যেন দর্শককে 'এন্টারটেন' করতে শুরু করেছে। 'সমিধের' পুরোনো মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও এই পচন রুখতে পারেনা শুভেচ্ছা তবুও সে সহযোদ্ধা হিসাবে পায় নির্মলাকে। কিন্তু জীবনের দুর্দশা এই বিপর্যয়ের সময়ে পারিবারিক জীবনে সে একদম একা হয়ে যায় অবশ্য ভালোবেসে বিয়ে করলেও নন্দিতা কোনদিন তার দোষর হয়ে উঠতে পারেনি কারণ স্ত্রীর যদি স্বামীর চেয়ে রোজগার বেশি হয়। আর সেই স্ত্রী যদি নন্দিতার মতো দাহটে হয়, তাহলে স্বামীকে সারাজীবন কী পিষতে হয়, তা শুধু শুভেন্দুই জানে।"

তন্নিষ্টা যে কী চায় সে নিজেই জানত না যদি না তার সাথে অভিমন্যুর দেখা হত। বন্ধুর বিয়েতে যে মানুষটির সঙ্গে সামান্য আলাপ সেই আলাপই ঘনিষ্টতর হয় প্রাক্তন কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। অভিমন্যুর শিখিত মনন, আর পাঁচজনের থেকে আলাদা ভাবনা চিন্তায় মুগ্ধ হয় তন্নিষ্টা কোথায় যেন শুভেন্দুকে খুঁজে পায়—

> "মানুষের মন থেকে কুসংস্কার মরে গেলে এক ধরনের সুরভি তৈরী হয়। বাবাও এই ধরনের কী একটা কথা বলে না? একটা ভাল নাটক, একটা ভাল বই, কিংবা একটা ভাল সিনেমা মানুষের মনে সুবাস ছড়িয়ে দিতে পারে।"

আকার নেই ভাবী স্বামী শৌনকের সঙ্গে তুলনা চলে আসে—

> "শৌনক কেরিয়ার সচেতন, উচ্চাকাঙ্খী, আবেগের চেয়ে যুক্তিকে বেশী প্রাধান্য দেয়, শৌনকের ভালোবাসা বড্ড তাড়াতাড়ি শরীরী হতে চায়।"

চিন্তাধারাতেও বিস্তর ফারাক দুজনের। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশ্নে শৌনক যেন 'রংবদলায়'-এর নীলাঞ্জন যুক্তিতেও অনেকটা একইরকম ধার "জীবনের তিনটে স্টেজ আছে। আমি বড় হচ্ছি, আমি অ্যাচিভ করছি, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। আমার বাবা-মা ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে আমি চাকরি বাকরি সব ছেড়ে সারাক্ষণ তাদের পাশে গালে হাত দিয়ে বসেরইলাম, এতে কি পৃথিবী একচুল এগোবে?"

শৌনকের এই স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খী মনোবৃত্তির পাশে নিজের সাফল্যের ছোট্ট ইঙ্গিত-টুকু যে সঠিক মর্যাদা পায় না তাও যেন সামান্য ঘটনার অভিঘাতে উপলব্ধি করতে পারে তন্নিষ্টা। তার স্লেট পাশের খবরটিকে কত সহজে পাশ কাটিয়ে দেয় শৌনক তন্নিষ্টা তখনও দোলাচলে— "শৌনকটা যেন কী, তন্নিষ্টা সুসংবাদটা শুনলাই-না ভাল করে।" আর সেই বাউন্ডুলে গন্ধ ব্যাপারী অভিমন্যু কিন্তু তন্নিষ্টার খবর নেয় শেষপর্যন্ত যখন অভিমন্যুর কারখানার হাজির হয় তন্নিষ্টা তখনই জানতে পারে অভিমন্যুর মনোরোগী দাদার কথা। অভিমন্যুর আত্মকথন বার করে এনে লেখিকা আমাদের সফল আপাত সুখী মানুষের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মারাত্মক লড়াইকে ব্যঙ্গ করেন—

> "যারা সাফ, তারা কি আমার দাদার চেয়ে খুব আলাদা? তারাও তো নিজেদের অন্ধবৃত্তে ঘুরে মরছে। লিভিং ইন এ মলিটারি মেল অফ দেয়ার ওউন।"

তন্নিষ্টার দোলাচল বাড়িয়ে দেয় অভিমন্যু। সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগা মেয়েটি মোহাবিষ্ট অভিমন্যুতে কিন্তু তখনও কাহিনীর ওঠাপড়া অনেক বাকী থেকে গেছে শৌনকের পরিবারের বিয়ে এগিয়ে আনার প্রস্তাবে হঠাৎ-ই আমুল নাড়া খায় তন্নিষ্টার হৃদয় যে বিয়েটাকে সে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিল মন থেকে আজ আর তাতে কোন আনন্দ খুঁজে পায় না। এ যেন তন্নিষ্টার আত্ম-আবিষ্কার —

> "তন্নিষ্টার বুকটা মুচড়ে উঠল সহসা। রাধাচূড়ার গাছ আবছা হয়ে যাচ্ছে। মুছে যাচ্ছে। সেখানে এক দাড়ি আলা যুবকের মুখ।"

নন্দিতা টিপিক্যাল আধুনিক একজন মা। যে সংসার জীবনে চাওয়া পাওয়াকে দাঁড়িপাল্লায় মেপে চলতে চায়। শুভেন্দু তার কাছে আদ্যন্ত একজন ব্যর্থ মানুষ এক আদ্যন্ত উচ্চাসাহীন পুরুষ, আঠাশ বছর আগে অ্যাকাউন্টেন্টে ক্লার্ক হয়ে জীবন শুরু, কেরানি অবস্থাতেই পূর্নচ্ছেদ।" এমনকি ভাই এর সঙ্গেও তার রেষারেষি। ভাই-এর বউ সামান্য একটা নেকলেশ পেলেও নন্দিতা খুশি হতে পারেনা। বৃদ্ধা মা-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়— "নন্দিতা মনে মনে দমে গেল। ক্ষীন আশা ছিল হারটা তিন্নিকে দেবে মা। তাই পাত্র খুঁজতে গিয়ে নন্দিতা মেয়ের জন্য অর্থ, সম্পদ গুরুত্ব দিয়েছে "এরকম একটা কোহিনুর কে চুঁড়ে বার করেছে সেটা বলো?" নির্মলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সহসাই বদলে যায় সমীকরণ নতুন করে শুভেন্দু সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হয় নন্দিতাকে — 'তবু এই মুহূর্তে শুভেন্দুর জন্য কষ্ট হচ্ছে বইকী। যে নাটক নিয়ে তাদের এত সংঘাত, যে নাটকের বাতির চরম অসুখী করেছে নন্দিতাকে, সেই নাটকের সঙ্গে শুভেন্দুর সংস্রব মুছে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তেমনটা হচ্ছেনা কেন, নন্দিতার মনের কোন্ গোপন কন্দরে এখনও শুভেন্দুর জন্য ভালবাসার বাষ্প সঞ্চিত আছে।

এই উপন্যাসের শাখা কাহিনির লেখিকা নাটকের বৃত্তে কর্মাশিয়ালাইজেশনের মধ্যদিয়ে ভাঙন ও ছোটপর্দার প্রতি একনিষ্ট নাট্যকারদের পয়সার লোভে ঝুঁকে পড়ার যে কাহিনী শোনাল তা একই সঙ্গে অতি বাস্তব সত্য এবং নাটকীয়। বাসবেন্দ্র চরিত্রটির আগ্রাসী মনোভাব-অহংবোধ ভীষণ বাস্তব হয়ে ধরা পড়ে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে নাট্যকর্মী অধ্যাপক নির্মল, রাজনৈতিক নেতা ননী সেন, কেমিষ্ট ভাস্কর প্রতিটি চরিত্রই অতি বাস্তব। তন্নিষ্টা ও অভিমন্যুর সম্পর্ক নতুন ভাবে শুরু হবে এই আশায় উপন্যাসটি শেষ করেন।

'হেমন্তের পাখি' – উপন্যাসটি বহুআলোচিত একটি উপন্যাস। অদিতির উপাখ্যান অনবদ্য এবং অসাধারণ। মধ্য চল্লিশের অদিতির একাকিত্ব যখন কিছুতেই কাটতে চায় না তখনই এক ঝলক টাটকা হাওয়া নিয়ে হাজির হন 'হেমেন মামা'। আপাত সুখী কৃতী সন্তানের জননী অদিতি নিজের ফেলে আসা জীবনের বিস্মৃত ভালোলাগাকে আবার নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনে। শুরু করে লেখালেখি। সুপ্রকাশ নিজে এক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার হলেও মানসিকতার দিক থেকে তার

পুরুষ অহং বড়ই তীব্র। স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে সে অবহেলা করেনা বটে কিন্তু অদিতির 'স্ত্রী' বা 'মা' ছাড়া স্বতন্ত্র কোন পরিচয় থাকতেও খুব একটা স্বস্তিবোধ করেনা। তাই এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের প্রাথমিক স্তরে অদিতির লেখা-লেখিকে সে অনেকটা ছেলেভুলানো খেলার ছলে দেখে কিন্তু সময় যত এগোয় লেখাটা যখন আর অদিতির time pass থাকে না হয়ে ওঠে অস্তিত্বের অংশ সুপ্রকাশ তেড়িয়া হয়ে যায় কুৎসিত ইঙ্গিতে ছিন্নভিন্ন করে নিজের স্ত্রীকে — "কোত্থেকে শানা এক বুড়ো ভাম মামা উঠেছে, মাথাটা একেবারে চিবিয়ে ঝরঝরে করে দিল। তোমাকে লেখিকা বানানোর জন্য তার এত কীসের ইন্টাররেষ্ট, হ্যাঁ? গাদাগাদা ছেলে এনে ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যখন তখন তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে কী এসবের বোঝা?" অথচ প্রাথমিকপর্যায়ে বৌ-এর এই গুণটাই হয়ে উঠেছিল সুপ্রকাশের কাছে মস্ত এক প্রদর্শনের বিষয়—প্রথম সাহিত্যসভায় যাওয়ার আগে অদিতির শাড়ী বেছে দেবার মতো তুচ্ছ কাজও করে দেয় অবলীলায়—

> "সুপ্রতিম ওয়ার্ড্রোজে চোখ বোলানো। আঙুল নেড়ে বলল, —ওই বটল গ্রীণ কলা ক্ষেত্রটা পরো। —এই গরমে সিল্ক। ওই গরজাম শাড়ী। বিয়েবাড়ী যাচ্ছি নাকি? —তো কী হয়েছে? একটা জায়গায় প্রথম যাচ্ছ, একটু তো সেজেগুজে যাওয়াই ভাল। লেখিকার গ্লেজ দেখে পাবলিক চমকে যাবে।"

সুপ্রতিম আসলে সাহিত্যকর্ম আর শাড়ী বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে কোন পার্থক্যই বুঝতে পারেনা। অদিতির অবস্থান তার কাছে সংসারকে মসৃন গতিতে চালিত রাখার একটা যন্ত্র মাত্র। তাই যে মুহূর্তে অদিতি তার হাতের বাইরে চলে যেতে পারে এই সম্ভাবনা তৈরি হয় সুপ্রতিম খেপে যায়।

অদিতির দুই সন্তান পাপাই-তাতাই দু'জনেই পড়াশুনায় মেধাবী। মা তাদের কাছে অতিপ্রয়োজনীয় একজন Caretaker থাকে না হলে জীবন যাত্রার প্রবাহ মসৃন থাকে না। তাই মায়ের অন্য অস্তিত্ব তাদের কাছে খুব একটা সুখবর নয়। বিশেষত পাপাই-এর অত্যধিক নারীপ্রীতি যখন মায়ের চোখে ধরাপড়ে যায় পাপাই দাঁত নখ দিয়ে রক্তাত্ব করতে ছাড়ে না মাকে "আমি যা করছি সেটা আমার ব্যাপার। তুমি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন?" পাপাই-এর তপ্ত ব্রিলিয়ান ছাত্রেরাই অর্থ সম্পদ প্রতিষ্ঠার লোভে বাপ-মার প্রতি কর্তব্যকে বুড়ো আঙুল দেখায়। গলা তুলে জানায় —

> "বাবা-মা দেশে পড়ে রইল ... মন কেমন করা ... এসব মধ্যযুগীয় সেন্টিমেন্ট আর চলে না মা। তুমি কি চাও শুধু তোমাদের বুড়ো বয়সে দেখভাল করার জন্য, টু বি মোর প্রিমাইজ, তোমার ছেলে শুধু তার মুখখানা তোমাদের দেখার জন্যে, নিজের ভূত ভবিষ্যত নষ্ট করে পচে মরুক।"

ছোট ছেলে তাতাই আবার একেবারে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। জেদী আর উদ্ধত তাতাই কলেজের প্রথমবর্ষ থেকেই নিজের ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় শূন্য । "খামচে খুমচে ঠিক টাকা রোজগার করে নেব। এত চারদিকে দুশো পাঁচশো হাজার কোটি টাকা গলে যাচ্ছে, কোথাও থেকে খাবলা মারতে পারবনা।"

অদিতি এ উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র, আর তার বুলিহীন টিয়া যেন অদিতির খাঁচায় পোরা জীবনের অনুষঙ্গকে তীব্রতর করে তোলার হাতিয়ার। জীবনের অর্ধেক পথ নিজস্ব চাওয়া পাওয়া হীন অদিতি যেদিন আশ্চর্য মানুষ হেমেন মামার সান্নিধ্যে এসে নতুন করে সাহিত্যকে সঙ্গী করে পথ চলতে চাইল সেদিনই ব্যক্তি মানুষ হিসাবে তার জীবনে যাবতীয় দ্বন্দ্ব আর দোলাচলের সূচনা। এতদিন যে অদিতি সংসার যা কিনা খাঁচারই নামান্তর তাকেই তার সম্পূর্ণ আকাশ বলে ভূল করছিল কিন্তু নিজের মতো করে বাঁচতে গিয়ে সে পেল পদে পদে বাধা। স্বামী-সন্তান কেউই যে মানুষকে শেষপর্যন্ত সঙ্গ দিতে পারে না বাঁচার জন্য যে নিজস্ব কিছু রসদ লাগে এই বোধ অদিতির তৈরী হল অতি ধীরে ধীরে—

> "খাটে শুয়ে লিখতে পারে না অদিতি, চেয়ার টেবিলে বসে না। মাটিতে শরীর ছড়িয়ে দিলে তার মনে হয় লেখার সঙ্গে এক প্রবল শারীরিক ও মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠছে, যেন অদিতি-ছুঁতে পারছে লেখাটাকে।"

এতদিনের সংসার জীবন যাপন সব কিছুই অভ্যস্ত গতে বাধা এক আলাপ মাঝে মাঝে শুধু বৈচিত্র্য নমাসে-ছমাসে বাপের বাড়ি যাওয়া বা একাকী মার্কেটিং সে সব সরিয়ে শিল্পিত জীবন-যাপনে অদিতি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল। যে একমাত্র দাদার সাথে সামান্য বাড়ির ভাগ নিয়ে মনান্তর হয়েছিল এক বৃষ্টি ভেজা দুপুরে বোনের ছোটবেলার সব জমানো লেখা ফিরিয়ে দিতে এসে কোথায় যেন দুভাই বোন অদিতি - অলকেশ ফিরে গেল ফেলে আসা শৈশবে। —

> "বৃষ্টি নেই। ফ্ল্যাটময় ফিরে বেড়াচ্ছে এক স্যাঁতসেঁতে বাতাস। সেন্টার টেবিলে ছড়িয়ে আছে অদিতির খাতা। নাকি মনিমুক্তো।"

অদিতির লেখিকা হবার প্রয়াস কিন্তু সমাজ সংসারকে ভুলিয়ে দিয়ে স্বার্থপর সাধনা ছিল না কিন্তু সুপ্রতিম-পাপাই-তাতাই এই নতুন অদিতিতে অভ্যস্ত হতে পারল না একেবারেই। এই উপন্যাসের পরিণতির পথ যত এগিয়েছে ততই লেখিকা সুচিত্রা

তাঁর চরিত্র অদিতির উপর পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল আক্রমণ তত শানিয়ে তুলেছেন আত্মভোলা, কাজপাগল সুপ্রতিম রাতে আলো জ্বেলে লেখা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেই থেমে থাকল না মদ্যপ হয়ে চূড়ান্ত অসভ্যতা করে সে চিনিয়ে দিল বিবাহিতা অদিতির সীমারেখা—

> "আগেত বলতে পারতাম। বলিনি। ওয়াচ করছিলাম। ভেবেছিলাম কাজকর্ম নেই, একটা কিছু নিয়ে থাকবে, ...। সাহিত্য অনেক হয়েছেন এবার ওসব ছাতায় মাথা বন্ধ কর।"

হেমেন মামাকেও সুপ্রতিম একদিন অদিতির অনুপস্থিতির সুযোগে তাড়িয়ে দিল। যুক্তি সাজাল নিপুনতায়—

> "নিজে বিয়ে না করেননি, উনি বিবাহিত মেয়েদের মান সম্মানের কথা কী বুঝবেন? তুমি তো লেখার জন্য সংসার ভাসিয়ে দিতে চাওনা। নাকি চাও।"

একদিকে সংসার অন্যদিকে সাহিত্য-এ যেন অদিতিকে বেছে নিতে বলা হল। অদিতি শেষপর্যন্ত পাঠককে বিমূঢ় করে সংসারকেই বাছল এক চিঠিতে সেই 'খোলাজানলা' হেমেন মামাকে লিখল "ছেলেরা শিল্পী লেখক হতে গিয়ে যদি বোহেমিয়ান হয়ে যায় সেও তো তাদের একটা গুণ, অথচ মেয়েরা লিখুক আর যাই করুক, তাদের কিন্তু থাকতে হবে এক লক্ষণরেখার মধ্যে।" সংসারের গন্ডিটুকু আঁকড়ে ধরে কিন্তু এখানেই যদি শেষ হত উপন্যাস তবে বোধহয় সুচিত্রা সুচিত্রা হতেন না। শেষ পর্যন্ত সেই খাঁচার বোবা পাখিটিকে এক সদ্য সকালে মুক্তি দিল অদিতি অনভ্যস্ত ভিতু পাখি উড়তে পারবেনা জেনেও কিন্তু পাখি উড়ল জড়তা সরিয়ে রেখে পাখির উড়ায় মুগ্ধ বিহ্বল অদিতি ছিঁড়ে ফেলল হেমেন মামাকে লেখা নিজের মৃত্যু-পরোয়ানা। অদিতি কী থেমে গেল? না। পাঠকের মনে এক আশ্চর্য স্বপ্ন বুনে দিয়ে উপন্যাস শেষ হল।

এই উপন্যাসের ভার কেন্দ্রে অদিতি আর তার মতো সংসারগত হাজারো মেয়েদের বেঁচে থাকার পৌন পৌনিকতাকে নতুন রুপ দিয়ে উপন্যাসটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন সুচিত্রা। পার্শ্বচরিত্রগুলি রেলে চাটুরীরতা সুজাত্য, তুলতুলি, রুন্টু। অলকেশ, শ্রেয়া সামান্য পরিসরে প্রতিটি চরিত্রই সুঅঙ্কিত তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল।

সুচিত্রার এই ছয়টি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের ছয়টি দীপ শিখার মত। এই ছটি উপন্যাসের আলোয় তাঁর মন্থন সাহিত্য বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ হয়ত সম্ভব নয় তবু এই উপন্যাসগুলো চরিত্রের হাত ধরে আমরা অতি সহজেই পৌঁছে যেতে পারি আধুনিক সমাজ সময়ের অন্দর মহলে। নীতি বর্জিত লালসা সর্বস্ব আধুনিক মানুষর চাহিদার বিচিত্রা বিভৎস রূপ অতি স্বল্প পরিসরে লেখিকা আমাদের সামনে তুলে ধরেন অনেক সমালোচক তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়ের পুনঃ উল্লেখের কথা বলেন উপন্যাসের আলোচনায় একথা হয়ত বা সত্যি বলে প্রমাণ ও হয় কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন আধুনিক মানুষের সমস্যাও তো একই বৃত্তে ওঠানামা করে তাই বোধিসত্ত্ব সুপ্রতিম নীলাঞ্জন তিন ভিন্ন পরিবেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের চিন্তা ভাবনা কমবেশি একইরকম। পাপাই শৌনিক বা ইন্দ্রজিৎ একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ সুচিত্রা কিন্তু এই ধ্বসে পড়া ভেঙে যাওয়া সমাজে দাঁড়িয়েও স্বপ্ন দেখেছেন সুস্থ মূল্যবোধের স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কের তাই তাঁর উপন্যাসে আমরা দয়িতা-রাখী-সুস্মিতা-তন্নিষ্টা-অদিতিকে পেয়েছি, পেয়েছি লাজবন্তীকে যারা সব কিছু হারিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিবেক-মূল্যবোধকে বলি হতে দেয়নি। লড়াই করেছে শেষপর্যন্ত। সুচিত্রার উপন্যাস এই মধ্যবিত্ত মানুষের পচনশীল সময়ের বিরুদ্ধে একক সংগ্রহকে বারংবার নিজস্ব ভঙ্গিমায় কুর্নিশ জানায় আর মুগ্ধ পাঠককে টান-টান চিত্রনাট্যে বুঁদ করে রাখে আদ্যন্ত — এখানেই তাঁর স্বকীয়তা এখানেই তাঁর লেখনীর যাদু বাস্তব।

গ্রন্থঋণ:

১। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, ভাঙনকাল, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ১৯৯৬
২। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, গভীর অসুখ, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ১৯৯৮
৩। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, নীলঘুর্ণী, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ২০০১
৪। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, রংবদলায়, সাহিত্যম, বইমেলা, ২০০০
৫। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, অন্যবসন, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ২০০০
৬। ভট্টাচার্য সুচিত্রা, হেমন্তের পাখি, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, ১৯৯৭